



যে নারীরা BIC-এর মালিক

যে ক্যাফেতে সাক্ষাৎ হওয়ার কথা, তার দরজায় এসে পৌঁছেছিলাম।

কাঁপছিলাম, তবে ভয়ে নয়। এ সেই কাঁপুনি, যা একটা সহজ প্রশ্ন করে: আমি কি ঠিক কাজ করছি, নাকি শেষ পর্যন্ত নিজেকে সীমার ওপারে ঠেলে দিয়েছি?

আরও একটা প্রশ্ন ছিল: এই অভিযান থেকে আমার লাভ কী? কোন কোন লক্ষ্য নিজের কাছ থেকেই এত গভীরে লুকিয়ে রেখেছি যে এখন আমি নিজেও আর চিনতে পারি না?

সাজিয়ে রাখা একটা গোলাপের দিকে হাত বাড়ালাম, তিনটে পাপড়ি ছিঁড়ে নিলাম, আর তা দিয়ে মুখে সুগন্ধ মাখলাম। আফটারশেভ সফরের বাজেটে ধরা ছিল না, কিন্তু শুধু পুরুষের গায়ের গন্ধ নিয়ে হাজির হতে চাইনি।

আমি ছিলাম L'Oréal-এর ছেলে জর্জের স্বদেশে, আর ওই কোম্পানি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিল।

আবহসংগীত হিসেবে আমার ওয়েবসাইটের গান চালিয়ে দিলাম। ঘটনাচক্রে যে গানটা বেজে উঠল, সেটা সেই গান, যা আমার বাবা আর দাদু একসঙ্গে বাজাতেন: ম্যাডোলাইন আর গিটার। ওঁরা আমার সঙ্গেই ছিলেন। আমরা তিনজন একসঙ্গে ঢুকলাম।

Chanel দূর থেকে আমাকে দেখে এগিয়ে এসে উষ্ণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল, যেন বহু বছর পর আবার দেখা হল দুই পুরোনো বন্ধুর। লম্বা। সোনালি চুল। নীল চোখ। চুল পরিপাটি করে বাঁধা। নেভি-ব্লু পোশাকে মোড়া এক শ্বাসরুদ্ধকর উপস্থিতি। এক মুহূর্তের জন্য প্রায় ইচ্ছে হল জিঙেস করি, গির্জা কোথায় পাব, যাতে এক্ষুনি ওকে বিয়ে করে ফেলতে পারি।

সে আমাকে টেবিলের দিকে নিয়ে গেল। ছয়জন নারী অপেক্ষা করছিলেন। বৈঠক শুরু হতে চলেছে, আর আমি আগে থেকেই জানতাম কোনো সংঘাত কখনও হবে না। আমার একটা জন্মগত ত্রুটি ছিল: জিততে জিততেই হারতে জানতাম।

প্রত্যেক নারীর সঙ্গে আলাদা করে পরিচয়পর্ব সারলাম, টেবিলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা না করেই। সেটা আপনা থেকেই জেনে গেলাম সেকেন্ড দশেক পরে।

প্রথম নারী নিজের নাম-পদবি জানালেন, আর আমি খাঁটি Gillette-এর মানুষের কায়দায় তাঁর হাতে চুম্বন করলাম। তারপর টেবিলের বাকি প্রত্যেক নারীর সঙ্গেও তা-ই করলাম, প্রত্যেককে উপহার দিলাম একটা হাসি আর একটা: “Enchanté.” মেড ইন কালাব্রিয়া।

কেবল তার পরেই নিজের নাম বললাম; আমার তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না যে ওঁদের প্রত্যেকেই আগে থেকে জানেন আমি কে।

ওঁরা জিজ্ঞেস করলেন কী পান করব, প্রাতরাশ করব কি না, হয়তো ছোট একটা পেস্ট্রি। বুঝিয়ে বললাম, আমার বরাবরের হোটেলের কর্মীরা সকালে আমাকে কিছুতেই বেরোতে দেয় না, যতক্ষণ না নিজের চোখে দেখছে যে আমি একটা জম্পেশ প্রাতরাশ সেরেছি। সবাই হাসিতে ফেটে পড়লেন।

তারপর জানতে চাইলেন, প্যারিসে এই আমার প্রথম আসা কি না। বললাম, বহু বছর আগে আমি সেন নদীর তীরে, নদীর ধারের বাগানগুলোয় কাজ করতাম; ফুল তুলে প্রতিদিন সকালে টাটকা পৌঁছে দিতাম নোত্র-দাম ক্যাথিড্রালে। করতাম এই অপেক্ষায় যে মা মেরি আমার ওপর সদয় হয়ে ওঁদের ছয়জনের সঙ্গে ঠিক এই সাক্ষাৎকারই ব্যবস্থা করে দেবেন। কখনও সন্দেহ করিনি। হাজার হোক, এ তো এক নারীর দেওয়া কথা।

ওঁরা হাসলেন। পরিবেশটা নরম হয়ে এল। আলাপে সহমর্মিতা ঢুকল।

তারপর ওঁদের একজন জিজ্ঞেস করলেন: “মিস্টার ফ্রেগা, ফ্রান্সের কোন জিনিসটা আপনার সবচেয়ে ভালো লাগে?”

“এ আবার কেমন প্রশ্ন?” উত্তর দিলাম। “উত্তর তো জানাই।”

BIC।

আলাপ তক্ষুনি মনোরম মোড় নিল।

একটু পরে ঠিক হল, মধ্যাহ্নভোজে বসে কথা চালিয়ে যাব; শাঁজেলিজে ধরে প্রায় একশো মিটার হাঁটলাম। গোটা পথটায় অবশ্য খেয়াল করছিলাম, সেই একই তিন কি পাঁচজন পুরুষ দূর থেকে আমাদের লক্ষ করছে। প্রথম মুহূর্ত থেকেই ওদের খেয়াল করেছিলাম। ওরাও আমাকে খেয়াল করেছিল। ওরা নিরাপত্তারক্ষী। কখনও খুব কাছে নয়। কখনও খুব দূরেও নয়।

আমরা একটা ফরাসি রেস্টোরাঁয় ঢুকলাম। সেই চিরাচরিত ফরাসি রেস্টোরাঁ, যেখানে পেটে পড়ে প্রায় কিছুই না, অথচ পকেট থেকে বেরিয়ে যায় একগাদা টাকা।

Chanel-কে ডাকলাম। সে তক্ষুনি আমার দিকে এগিয়ে এল।

“কী হল?”

“আমরা চলে যাচ্ছি।”

“চলে যাচ্ছি?”

“হ্যাঁ। আপনাদের সবাইকে আমি এক জায়গায় খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছি।”

পুরো এক মিনিট ওঁরা জমে দাঁড়িয়ে রইলেন। অতিথিই নাচের নেতৃত্ব দিচ্ছে — এমনটা দেখতে ওঁরা অভ্যস্ত ছিলেন না। তবু আমার প্রস্তাব এতই জোরালো ছিল যে সবাই পিছু নিলেন। মোরগের পেছনে হাঁটা মুরগির মতো। অবশ্য আমরা তো মোরগের দেশেই ছিলাম।

প্রথম যে পিৎজা আর স্যান্ডউইচের দোকানটা পেলাম, সেখানেই গিয়ে পৌঁছালাম। ঢোকান আর মালিকের কাছে এগিয়ে গেলাম।

“সাতটা স্যান্ডউইচ চাই, প্রতিটা পাঁচ ইউরো, পানীয়সহ।”

“আর দাম দেব আমি।”

রফা হয়ে গেল। ভালো ছাপটাও পড়ে গেল।

আমরা ভেতরে ঢুকলাম। ওঁদের দেখে মনে হচ্ছিল সম্পূর্ণ হতভম্ব, যেন উড়ন্ত ঘোড়ার ডানায় চড়ে চলেছেন, ঠিক কী ঘটছে বুঝে উঠতে পারছেন না।

ওঁরা তখন GILLETTENARRATIVE-এর ভেতরে। অথচ ওঁদের কেউই তখনো তা জানতেন না।

ফের্দিনান্দো